তারিখ 14 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৭

শিক্ষা ও জাতিসত্তার আবেদন

সমাজ | এমাজউদ্দীন আহমদ

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা; সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্র্যান্ড রাসেলের মতে, আধুনিককালে কোনো জনপদে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথম মতবাদে বলা হয়, শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এজন্য ব্যক্তির পথের সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতাগুলি অপসারণ করা। দ্বিতীয় মতবাদে বলা হয়, শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান এবং রুচিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তৃতীয় মতবাদে বলা হয়, শিক্ষাকে ব্যক্তিগত সৌকর্য বৃদ্ধি নয়, সার্বিকভাবে সমগ্র সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে দেখা উচিত, যেন শিক্ষার মাধ্যমে জনসমষ্টি এবং দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। এই তিনটি মতবাদের মধ্যে প্রথমটি হলো সর্বাধুনিক এবং তৃতীয়টি সবচেয়ে পুরনো। তার মতে, কোনো জনপদে শিক্ষাব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার জন্য এই তিনটির কোনো একটি স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং তিনটি থেকে বাছাই করা মূল্যবান উপাদানগুলির সুচিন্তিত সুসামঞ্জস্য ব্যবস্থাই হলো শিক্ষা।

রাসেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমার শুধু ছোট্ট একটা সংযোজন রয়েছে। বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছার সঙ্গে মানবতাবোধের সংযোজন ঘটিয়ে এবং তার সঙ্গে সততা এবং উদারতার আলোয় মানব মনকে আলোকিত করার আদর্শিক অঙ্গীকারের আবেগ মাখিয়ে দিলে যে কোনো জনপদে শিক্ষা শুধু যে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে তাই নয়, ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে তুলে সমাজ ও জাতিসত্তা, এমনকি তারও ঊর্ধ্বে সামগ্রিকভাবে বিশ্বমানবতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা সহজ হয়। এভাবে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এটি না সনাতন, না আধুনিক। বাংলাদেশের শিক্ষায় না আছে ব্যক্তিত্ব গঠনের সূত্র, নেই জাতি গঠনের চিৎশক্তিও। বিভিন্ন কালের সংগৃহীত উপাদানগুলোর আলগা সংযোজনে গড়ে ওঠা এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থা এটি। হিন্দু ভারতের টোল-চতুষ্পাঠীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মুসলিম ভারতের মক্তব-মাদ্রাসা এবং তার সঙ্গে আলগাভাবে জড়িত হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ শিক্ষা। এই শিক্ষা সবাইকে এক সূত্রে গ্রথিত করে না। সবার জন্য মিলনের ক্ষেত্রও রচে না। বরং সবাই যেন ভিন্ন অবস্থানে অনড় থাকে তার ব্যবস্থা পাকা করেছে। এই শিক্ষা না উচ্চারণ করে সহযোগিতার মন্ত্র, না সৃজন করে আত্মার বন্ধন। এটি খণ্ডছিন্ন, বিভেদ-সূচক, নিরানন্দ। আমাদের দেশের শিক্ষা একদিকে যেমন প্রাণহীন, অন্যদিকে তেমনি গতিশীল জীবনের জন্য অর্থহীন। তাই উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং অর্ধশিক্ষিতদের কেউ কোনো সৃজনশীল উদ্যোগে এখন পর্যন্ত সফল হলো না, কেননা এদের কাউকে সৃজনশীলতার জাদু স্পর্শ করতে পারেনি। শিক্ষিত হয়েও অনেকে প্রশিক্ষিত মনের অধিকারী হতে পারেননি।

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারা বর্জন করে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল এই নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারত শাসনে এই অঞ্চলে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তাদের সহায়ক এবং সমর্থক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করাই ছিল এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। তখন থেকে এ দেশে আসে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শব্দ। ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে সরকারি চাকরি লাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি অর্জন ইত্যাদি লোভনীয় ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। ইংরেজির মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে দ্রুত।

আমার মনে হয়েছে, দেশে যে শিক্ষা চালু রয়েছে, বর্তমানের জন্য আংশিকভাবে তা ফলপ্রসূ হলেও ভবিষ্যতের জন্য, বিশেষ করে এই শতকের মহাসমারোহে মর্যাদার সঙ্গে টিকে থাকার জন্য তা মোটেই উপযোগী নয়। শিক্ষার

বিভিন্ন স্তরে নির্দিষ্ট পাঠক্রম সাধারণ ভাবনা-চিন্তার দুর্গে প্রবেশ করার জন্য উপযোগী হলেও যে দুর্গ আত্মরক্ষা এবং নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত, সেখানে প্রবেশাধিকার দান করবে না। এই শিক্ষা শুধু কর্মজীবনের সাধারণ গৃহে প্রবেশের সাহস বা সামর্থ্য জোগায় না। এ জন্যই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার অপরিহার্য হলেও এ সম্পর্কে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন কিন্তু এখন পর্যন্ত যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন জাতির সার্বিক প্রস্তুতি। প্রয়োজন জাতির রাজনৈতিক দৃঢ় সংকল্প। এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনি যে, ক্ষমতাসীন দল শুধু দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমেই শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করতে চেয়েছে। অন্যান্য দেশে এ দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশেষজ্ঞদের ওপর। তাছাড়া আরও একটি কারণে বাংলাদেশে শিক্ষানীতি কোনোদিন বাস্তবায়িত হয়নি।

গত ৪৬ বছরে কোনো সরকার শিক্ষা কার্যক্রমকে কোনো সময়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রূপে গ্রহণ করেনি। কয়েকটি দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হবে। এক, কোনো সরকারের আমলে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে দেখা গেছে, কাউকে মন্ত্রী করতে হবে অথচ তার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাকে শিক্ষামন্ত্রী করা হলো। দুই, বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সব সময় হয়েছে অতি অল্প। বেশ কয়েক বছর থেকে একটু বেড়েছে বটে, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন তার ধারেকাছে কোনো দিন এ বিনিয়োগ আসেনি। কোনো উন্নত দেশের দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর দিকে তাকাই, তা হলেই চলবে। যে ক্ষেত্রে ওইসব দেশ মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৪.৫ থেকে ৫ ভাগ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করছে, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যয় করছে শতকরা ২ ভাগের মতো। যে উচ্চশিক্ষা সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রকে প্রণোদিত করে থাকে, সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ একেবারেই অপ্রতুল। তাই বলি, অতীতে প্রণীত শিক্ষানীতি যে বাস্তবায়িত হয়নি তা পীড়াদায়ক নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রও তৈরি হয়নি কোনো সময়। তাছাড়া যখনই কোনো আন্দোলনের সূচনা হয় দেশে, তখন সেই আন্দোলনের প্রথম শিকার হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন এ ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করেনি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের মতো চলতে দেয়নি।

মানবজীবনকে আমরা দ্বিমাত্রিক প্রত্যয় হিসেবে দেখতে পারি। এর একটা দিক হলো প্রায়োগিক, বাহ্যিক বা জৈবিক। এই পর্যায়ে সফল হতে হলে যে শিক্ষার প্রয়োজন হয় তা দক্ষতা অর্জনের, কোনো পেশা গ্রহণ করতে চাইলে সে জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়ার, প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার, সব কর্মনৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করার, সমাজব্যবস্থাকে মানুষের উপযোগী করার। এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা, সক্ষমতা, নৈপুণ্য হলো একরাশি মণিকাঞ্চন। এ জন্য তরুণ-তরুণীদের শিখতে হবে বিজ্ঞানের হাজারো সূত্র, প্রযুক্তির হাজারো প্রকরণ। জানতে হবে সমাজ জীবনের অসংখ্য নীতি অথবা দুর্নীতির গ্রন্থি সম্পর্কে। দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচিতে যেভাবে ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবহার বিজ্ঞান বা আইন সংন্যস্ত হয়েছে তা এ লক্ষ্যেই।

মানবজীবনের আর একটি প্রত্যয় হলো মানসিক অথবা আত্মিক। জীবনের এই দুই মাত্রার সুষম বৃদ্ধি হলেই শুধু জীবন পরিপূর্ণ। আত্মিক প্রত্যয়কে অপরিণত রেখে কেউ যদি প্রায়োগিক মাত্রার শ্রীবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয় অর্থাৎ পার্থিব জীবনের জন্য দক্ষতা, নৈপুণ্য, সক্ষমতা অর্জন করে তাহলে সে হয়ে উঠবে অহঙ্কারী, ক্ষমতালিপ্সু, স্বার্থপর, লোভী। অন্যদিকে শুধু আত্মিক প্রত্যয় সুদৃঢ় হলে এবং পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সে হয়ে উঠবে পরনির্ভরশীল, হীনমন্য, নির্দয়, ষড়যন্ত্রপ্রিয়। তাই জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য শিক্ষা হতে হবে একদিকে যেমন পার্থিব বা প্রায়োগিক প্রত্যয়কে শক্তিশালী করার মাধ্যম, তেমনি আত্মিক বা মানসিক উন্নয়নের বাহনও। আত্মিক বা মানসিক প্রত্যয়ের জন্য প্রয়োজন ধর্ম শিক্ষা, নৈতিকতার পাঠ গ্রহণ, সংস্কৃতি চর্চা, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন যেন মানুষের মন হয় উদার, সুরুচিসম্পন্ন, সুনীতি সমৃদ্ধ, পরিশীলিত। আমাদের দেশে মানুষকে দক্ষ, কর্মচঞ্চল, সক্ষম করার জন্য সাধারণ শিক্ষা এক ধরনের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ধর্ম শিক্ষাও আত্মিক প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুই স্রোতধারা এখনও প্রবাহিত হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে, অনেকটা সমান্তরাল গতিতে রেলের দুটি লাইনের মতো। চলছে পাশাপাশি, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। এটি কোনোক্রমে কাম্য নয়। সমাজজীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ করতে হলে এই দুই ধারার সম্মিলন একান্তভাবে প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মাটিকে উর্বর, সবুজ, শস্যশ্যামল, ফলপ্রসূ করতে পদ্মা-যমুনা-মেঘনার সম্মিলিত স্রোতধারা যা করছে, আমাদের নতুন প্রজন্মকে সৃজনমুখী, সৃষ্টিশীল করতে, তাদের মধ্যে বিশ্বজয়ের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটাতে, আকাশছোঁয়া উদারতার আলোয় তাদের উদ্ভাসিত করতে তেমনি প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষাকে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্মিলিত করে সমাজব্যাপী নতুন জীবনবোধ সৃষ্টি করা যেন দক্ষতার সঙ্গে সততা, নৈপুণ্যের সঙ্গে পবিত্রতা, বিশেষ করে সক্ষমতার সঙ্গে সহিষ্ণুতার বিকাশ ঘটে এবং বাংলাদেশ হয়ে ওঠে সুশিক্ষার এক আদর্শ স্বর্ণদ্বীপ।

'বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত

প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর